দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 2 9 ... 1989
পৃষ্ঠা 5 3

068

সার্টিফিকেট প্রবণ শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর কাজী সালেহ আহমদ বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনকালে এক সমাজের একটি গুরুতর প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন: তিনি বলেছেন, কর্মজীবনে সত্যিকার শিক্ষা ও দক্ষতার মূল্যায়ন না করায় ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার পরিবর্তে পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটের জন্য বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে। এর ফলে নকল প্রবণতা বাড়ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের এ কাজে অভিভাবকরা সহায়তা করছেন।

আমাদের শিক্ষা, কর্ম ও সমাজ অঙ্গন সম্পর্কে একথা খুবই সত্য। শিক্ষাঙ্গনে সার্টিফিকেট প্রবণতা যে নকল করতে উৎসাহ যোগাচ্ছে এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের চেয়ে বহু ছাত্র যে যেনতেন প্রকারে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করতে চায়, ভাল ফল করতে চায় পরীক্ষায়, সে কথাও সবাই স্বীকার করবেন।

কিন্তু এই প্রবণতা কেন সৃষ্টি হল সে সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করা দরকার। সমস্যার মূলে আঘাত করা যাচ্ছে বলে নকলের সমস্যা আজ শিক্ষাঙ্গনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় রূপ নিয়েছে। প্রফেসর সালেহ আহমদ বলেছেন, কর্মজীবনে সত্যিকার শিক্ষা ও দক্ষতার মূল্যায়ন না করায় ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার পরিবর্তে পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেটের জন্য বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে।

চাকরির জীবনে একথা সত্য। যেকোন চাকরির আবেদন করার জন্য বেঁধে দেয়া হয় কমপক্ষে দুইটি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ থাকতে হবে, কিংবা সকল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে, অনার্স থাকতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব শর্ত পূরণের জন্য যদি ছাত্র ও অভিভাবকরা অসাধু পথের আশ্রয় নেয়, তাহলে কতটা দোষ দেয়া যাবে তাদের?

কিন্তু যদি চাকরির ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা থাকত যে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার পর বাকীটা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পূরণ করা হবে তাহলে হয়ত নকলের উন্মত্ত প্রবণতা হ্রাস পেত।

শুধু যে কর্মজীবনেই সার্টিফিকেটকে মূল্য দেয়া হয় তাই নয়, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারেও সার্টিফিকেটের গুরুত্ব এখন অপরিসীম। এখানে উচ্চ শিক্ষা সহজলভ্য নয়। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি আসন যোগাড় করতে হয়। সেখানেও বাঁধা ধরা নিয়ম আছে। প্রথম বিভাগ থাকতে হবে, উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত পারসেন্ট নম্বর পেতে হবে—এমন সব আইন। প্রত্যেক অভিভাবকই চান তার সন্তান উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাক। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্য যে ন্যূনতম যোগ্যতার দরকার, সেটুকু যেনতেন প্রকারে সন্তান সন্ততিকে তারা পাইয়ে দেবার চেষ্টা করেন। ফলে অভিভাবকরাই সন্তান-সন্ততিকে নকলের জন্য সুবিধাজনক কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দেয়ানোর ব্যবস্থা করেন, ঢাকার কেন্দ্র থেকে ছেলেমেয়েকে নিয়ে যান সুদূর মফস্বলের কেন্দ্রে, নকল করিয়ে পাস করতে। এর কারণও ওই একটাই, সার্টিফিকেট চাই।

সামাজিক ব্যবস্থাই এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে সর্বত্র সার্টিফিকেটের কদর বেড়ে গেছে। এই অবস্থা স্বাধীনতা আগে পর্যন্তও এতটা জটিল ছিল না। এখন জটিলতা ক্রমশ বাড়ছেই। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ কর্তারা বলতে পারেন, নকল প্রবণতা এমনভাবে বেড়েছে যে ন্যূনতম পাসের যোগ্যতা দিয়ে আর মেধা যাচাই করা যাচ্ছে না, একই যুক্তি হয়ত উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিরাও দেবেন। কিন্তু তাতে তো সমস্যার জটিলতা বাড়ছেই।

এক্ষেত্রে সবচেয়ে যা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হল প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ ক্রমশই সংকুচিত হয়ে আসছে, জাতির ভবিষ্যতের জন্য যা সবচেয়ে মারাত্মক। দরিদ্র দেশ আমাদের। এই দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য দরকার প্রকৃত শিক্ষিত, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মীবাহিনী। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান অরাজকতামূলক ব্যবস্থা বহাল থাকলে আমরা কিছুতেই সেই কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে পারব বলে মনে হয়। এতে জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির আশা হবে সুদূরপরাহত।

দেশের শিক্ষাঙ্গনের এই সার্টিফিকেট প্রবণতা দূর করার জন্য সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষকেই এ বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে। নকল প্রবণতার অশুভ ও বিনাশী প্রবণতা রোধ করার পথ উদ্ভাবন করতে হবে।

কিন্তু কী তার উপায়?

শুধুমাত্র কর্মজীবনে প্রবেশেই যে সার্টিফিকেট মূল্যবান তা নয়, উচ্চতর শিক্ষাজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রেও সার্টিফিকেট মূল্যবান। কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য দরকার উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজায় পৌছানোর জন্য প্রয়োজন সার্টিফিকেট। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন এই এক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে খাবি খাচ্ছে। নকল প্রবণতা গ্রাস করছে গোটা শিক্ষাঙ্গনকে। এর জন্য কয়েকটি ব্যবস্থার কথা চিন্তা-ভাবনা করে দেখা যায়। যেমন (এক) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ: দেশের অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এখন বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তাতেও ডিভিসনের জন্য একটা নম্বর নির্ধারিত আছে। অর্থাৎ মেধা যাচাইয়ের জন্য যে লিখিত পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে তাতে কোন ছাত্র সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েও ভর্তির সুযোগ না-ও পেতে পারে। আবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল করে বেশী নম্বর পেয়ে কোন ছাত্র মেধা যাচাই পরীক্ষায় সামান্য নম্বর পেয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা নকলপ্রবণতার অনুকূলেই থেকে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা কি করা যায় না যে নির্ধারিত ন্যূনতম নম্বর পেলে যে কোন ছাত্রছাত্রী ভর্তির আবেদন করতে পারবে এবং বাকীটা নির্ভর করবে শুধুমাত্র বিজ্ঞানসম্মত লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। তাহলে এসএসসি—এইচএসসিতে নকল নিয়ে এই হাঙ্গামার কিছুটা হলেও অবসান ঘটে বলে মনে হয়। কেননা সেক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্যতারই বিচার হবে বলে বিশ্বাস জন্মাত ছাত্র অভিভাবকদের মনে। (দুই) কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের ক্ষেত্রেও মেধা ও দক্ষতাকেই বড় করে দেখা প্রয়োজন, সার্টিফিকেটকে নয়। এখানেও সংশ্লিষ্ট কাজের ধারা অনুযায়ী প্রশ্ন করে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করার ব্যবস্থা করা দরকার। সেই পরীক্ষাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার মত দুর্নীতিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই দুটি ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হলে সার্টিফিকেটমুখী শিক্ষা প্রবণতার অনেকখানি অবসান ঘটত।

এছাড়া পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনাও নকল রোধের জন্য জরুরী।

আসলে জ্ঞানের চর্চার অভাবই শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। শিক্ষার অঙ্গনে সংশ্লিষ্ট সবাই যদি জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে আন্তরিক হন যদি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ব্রতী হন। তাহলে সার্টিফিকেটমুখী শিক্ষার বদলে জ্ঞানার্জনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন সহজ হয়ে উঠতে পারত। এই প্রয়াসে সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকল মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন আর তাতেই জাতির কল্যাণ।

—রেজোয়ান সিদ্দিকী